OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 377 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 377 - 384
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

তপন সিংহের চিত্রনাট্যে রূপান্তরের শৈল্পিক দর্শন

শতাব্দী ধন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
Email ID: dhanshatabdi96@gmail.com
000-0009-0007-5740-075X

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Filmscript, Literature, Transformation, Narrative, Diversity, Audience, Film, Reader, Philosophy, Artistic Sense.

Abstract

Although Tapan Sinha was one of the leading directors of Bengali cinema, his name seems to have remained somewhat in the background. Yet, like Satyajit and Ritwik, his contribution to the world of cinema was immense. He made a significant contribution to Bengali cinema by adding several valuable films to its rich heritage. Nevertheless, within the narrow confines of the two covers of books, his cinematic life has somehow remained inaccessible to viewers and readers like us. In 1978, he wrote 'Byoscopeer Banke Banke', in 1995 'Mone Pore', and in 2006 'Kichhu Chhaya Kichhu Chhobi'. These three memoir-based books were written at long intervals. Through various anecdotes in these books, many previously unknown aspects of his cinematic life come to light. Taken together, they enable us to understand Tapan Sinha's overall life in cinema.

Tapan Sinha entered the world of cinema in 1946. At New Theatres, he began his professional career as an assistant sound technician to Bani Dutta. His favourite director was Bimal Roy. When Bimal Roy was making the film 'Anjangarh', the young Tapan Sinha first entered a film studio. He was a brilliant student of physics. Therefore, he was able to perform his duties as an assistant sound technician with considerable skill. However, he did not stop there; his dream was to become a film director, and that was why he entered the world of cinema. He himself repeatedly said that he became associated with the world of cinema not merely to become a sound technician, but with the ambition of becoming a director. For a brief discussion of Tapan Sinha's overall cinematic life, films such as 'Kalamati', 'Hansuli Banker Upakatha', 'Nirjan Saikate', 'Jatugriha', 'Apanjan', 'Saginaa Mahato', 'Ekhoni', 'Raja', 'Harmonium', 'Adalat O Ekti Meye', 'Atanka', 'Antardhan', 'Wheel Chair', and 'Shatabdir Kanya' may be considered. Two short films may also be included in the discussion: 'Adami Aur Aurat' and 'Didi'.

Literature and cinema are two distinct artistic mediums, and the way in which they are enjoyed is also different. Literature is primarily meant to be read, whereas cinema, from its early period, has been visual and, from a later period, audiovisual. A film is created on the basis of a story. As a result, in the

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 377 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

early years of Bengali cinema, many films were made based on the short stories and novels of well-established literary figures.

Film director Tapan Sinha also relied on literary works in most cases while making his films. During his nearly fifty-year career in cinema, he wrote a total of 44 screenplays. Based on these 44 screenplays, he made 29 films adapted from literature, 12 original films, 2 Hindi versions of literature-based films, and 1 documentary. In terms of subject matter, each of Tapan Sinha's films was distinct. While making films and writing screenplays, he always looked for new subjects and new characters. In his screenplays, he skillfully blended his artistic qualities, contemporary social, economic and political realities, and circumstances with real-life stories. As a result, his films never became artificial. Rather, his dedication to filmmaking and the excellence of his artistic abilities gave his films another dimension.

In fact, while reading a story or novel, readers continuously weave an imaginary picture in their minds. But in cinema, everything becomes visually explicit, so that possibility largely disappears. We should therefore view a literature-based film and an original film through the eyes of both the viewer and the reader, just as we view a short story or novel from a reader's perspective. Only then will we be able to return to and truly experience the overall cinematic life of Tapan Sinha.

Discussion

তপন সিংহ (১৯২৪-২০০৯) তাঁর সমগ্র চলচ্চিত্রজীবনে অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রনাট্য নির্মাণ করেছেন ও চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। বড়পর্দা ও ছোটপর্দা — এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তবে বড়পর্দার জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যাই বেশি। এই চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে বিপুল পরিমাণে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নানা ধরনের ও বিচিত্র স্বাদের কাহিনি তিনি চলচ্চিত্রের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর পুনরাবৃত্তি সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' ছোটগল্প অবলম্বনে 'অঙ্কুশ' চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। কখনো হাতির গল্প, কখনো হাসির গল্প, পিতৃহৃদয়ের আকুতি, কারাজীবন, প্রেমের কাহিনি, পূর্বজন্ম ও বর্তমান জীবন মিলেমিশে যেন এক রহস্যের অবতারণা, রাজার ভূমিকায় অভিনয়ের অ্যাডভেঞ্চার, আঞ্চলিক মানুষের জীবনকথা, সমুদ্রের উদারতায় বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তি ও অপমানভার লাঘব, বিবাহ বিচ্ছিন্ন নর-নারীর হৃদয়ানুরাগের অবশেষটুকু নিয়ে একাকিত্বে ফিরে যাওয়া, মধ্যবয়সী মানুষের বিদ্যানুরাগ, গণ্ডিবদ্ধ মানুষের প্রকৃতিলগ্নতা, হাটে বাজারে ঘোরা এক ডাক্তারের জীবন, শ্রমিক আন্দোলন, আন্দামানের পটভূমিকায় রহস্যের সন্ধান, এক সাধারণ গ্রামীণ নারীর চারিত্রিক পদস্খলন, মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, আবার একই পেশায় থেকে সহকর্মীর ক্ষতিসাধন, মধুচক্রের শিকার হয়ে ফুলের মতো নিষ্পাপ একটি মেয়ের হারিয়ে যাওয়া, ভূতের গল্পের মজা — তপন সিংহের নির্মিত চিত্রনাট্য তথা চলচ্চিত্রের দিকে তাকালে এভাবেই আমরা অফুরান বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখতে পাই। সাহিত্য থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রের মূলত শিল্প মাধ্যমের পরিবর্তনের জন্যই ঘটে। তাই কখনো হাত ধরে, কখনো প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে উভয়ের পথ চলা। কাহিনি ও চরিত্রের সংযোজন-বিয়োজনও সে কারণেই হয়। চলচ্চিত্রকারকে গল্প ও উপন্যাসের কাহিনির রূপান্তর ঘটাতে হয় চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই। তবে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রকার পৃথক হলে ব্যক্তিত্ব, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন, মূল্যবোধের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই কাহিনির রূপান্তরে ঘটেই যায়। এবার আমরা তপন সিংহের নির্বাচিত সাহিত্যনির্ভর বাংলা চলচ্চিত্রগুলির অর্থাৎ বাংলা গল্প-উপন্যাস থেকে যে সমস্ত চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের রূপ পেয়েছে সেগুলোর থেকে কয়েকটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ও দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রনাট্যগুলিকে ('হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'জতুগৃহ', 'সাগিনা মাহাতো', 'এখনই', 'রাজা', 'আদমি অউর অওরত' এবং 'দিদি') আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 377 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৬২) : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এক দীর্ঘ, বিস্তৃত পরিসরে লেখা উপন্যাস। কিন্তু চলচ্চিত্রে পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার তপন সিংহ পুরোটাকেই ঘন বুননের মধ্যে দেখিয়েছেন। চিত্রনাট্যের মধ্যে তিনি বাঁশবাঁদির মূল নির্যাসটুকু তুলে এনেছেন। উপন্যাসের অনেক চরিত্রকেই চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে বর্জন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বনওয়ারীর দুই স্ত্রী গোলাপী বালা ও সুবাসী কাউকেই দেখানো হয়নি। পরে পাখীকে পরিত্যাগ করে করালীর সুবাসীকে বিবাহের অংশটুকু চলচ্চিত্রে বর্জিত হয়েছে। পাখী চরিত্রটির আত্মহত্যা এবং আরও বহু মৃত্যু চলচ্চিত্রের সীমিত পরিসরে স্থান পায়নি।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প, উপন্যাসে পুরাতনের প্রতি বেশিই পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। তার প্রতি মমত্ববোধ তাঁর হৃদয়ের গভীরতল স্পর্শ করে উঠে আসে। তাই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে আমরা দেখি প্রাচীন প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকা বনওয়ারীর মৃত্যু হয়। তার স্ত্রীকে বিবাহ করে নতুন সংসার করে করালী। প্রাচীন প্রথা, চিন্তা-ভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে এ হল নূতনের প্রতিষ্ঠা। তপন সিংহ এই একই উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন শুধু বনওয়ারীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। করালী চরিত্রের প্রতিষ্ঠা এখানে শেষে দেখানো হয়নি। প্রাচীন রীতির অবসান শুধু দেখা হয়েছে। তার থেকে দর্শক অনায়াসেই বুঝে নিতে পারে এ হল নতুনের প্রতিষ্ঠা।

উপন্যাসের শেষে দেখি, বাঁশবাঁদিতে কচি কচি ঘাস গজিয়েছে। সেখানে করালী সকলকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে চায়। প্রাচীন ভাবধারার মধ্যে দিয়ে নতুনের প্রতিষ্ঠা চলচ্চিত্রে দেখানো হয়নি। নসুবালার মতো চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। সে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। কিন্তু তপন সিংহ তাকে পূর্ণাঙ্গ নারীরূপে চিত্রনাট্যে চিত্রিত করেছেন। এটি উপন্যাসের পাঠকের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি করে। জানা যায়, পরিচালক তপন সিংহ নিজেও এর জন্য পরবর্তীতে আক্ষেপ করেছিলেন।

যাইহোক, চিত্রনাট্যে এই উপন্যাসটিকে তপন সিংহ স্বকীয় মাত্রা দিয়েছেন। চলচ্চিত্রটি দর্শকদের কাছে আরও অনেক সাবলীল, সহজবোধ্য রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়ণের জন্য তপন সিংহ আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ পুরস্কার কি টু দ্য সিটি অফ সানফ্রান্সিসকো পান।

জতুগৃহ (১৯৬৩) : সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ' গল্প ও তপন সিংহের 'জতুগৃহ' চলচ্চিত্রটি পাঠক ও দর্শকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিতে ধরা দেয়। 'জতুগৃহ' শীর্ষক ছোটগল্পটি মাত্র কয়েক ঘন্টার ঘটনাকে শব্দে বিন্যস্ত করে রচিত। কিন্তু চলচ্চিত্রের কাহিনি বেশ কয়েক বছরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। গল্পে হঠাৎই একদিন রেল প্ল্যাটফর্মের প্রতীক্ষালয়ে দেখা হয়ে যায় মাধুরী ও শতদলের। কয়েক বছর আগে যারা বিবাহের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে দেখা যায়, শতদল একজন সেলাই স্কুলের শিক্ষিকা সুধাকে বিয়ে করে আর মাধুরী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার অনাদি রায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। মাধুরী ও শতদল দু'জনেই পুরোনো জীবনকে পেছনে ফেলে পৃথক পৃথকভাবে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। গল্পকার তা পাঠককে জানিয়েছে। এখন শতদলের চোখে এই মাধুরীর সাজকে মনে হয়—

> "এমন মেঘ রঙের ক্রেপের শাড়ি তো কোনোদিন পরেনি মাধুরী, এমন করে এত লম্বা আঁচলও মাধুরীকে কখনো লুটিয়ে দিতে দেখেনি শতদল। বেড়াতে যাবার সময় মাধুরীকে পরতে হতো তাঁতের শাড়ি, ঢাকাই বা অন্য কিছু, — চলতে গেলে যে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ফিসফিস করে অদ্ভুত এক শব্দের সুর শিহরিত হয়। আঁচলে অবশ্যই মাখতে হতো একফোঁটা হাসনুহানার আরক। এইভাবে সুর ও সৌরভ হয়ে শতদলের পাশে পাশে চলতে হতো মাধুরীকে, ...সেই সুর আর সৌরভের কোনো অবশেষ আজ আর নেই। মাধুরী বসে আছে এক নতুন শিল্পীর রুচি দিয়ে গড়া মূর্তির মত, নতুন রঙে আর সাজে।"[১]

অন্যদিকে, মাধুরীর চোখেও বদলে গেছে শতদল। মাধুরীও বোঝে—

> "সুধা ভাল করেই সব বদলে দিয়েছে।"[২]

মাধুরী আর শতদল পরস্পরকে ভালোবেসে যে ঘর বেঁধেছিল, তা এখন ভেঙে গেছে। তাদের এই সুখের নীড় ভেঙে যাওয়ার নেপথ্যে ছিল পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার অভাব। তারা নিঃসন্তান দম্পতি হলেও কখনো সেই সন্তানের অভাব তাদের সম্পর্কের মধ্যে বড় বাধা হয়ে ওঠেনি। সন্তানহীনতার যন্ত্রণা বা তার ইঙ্গিত গল্পের মধ্যে পরিস্ফুট হয়নি। এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 377 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সন্তানহীনতার যন্ত্রণার পরিসরটিকে চিত্রনাট্যকার তপন সিংহ বেশি করে আলোকিত করেছেন। সব শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক বছর পরে শতদল ও মাধুরীর দেখা হয়। তবু ধীরে ধীরে যেন অতীতকে দু'জনেই একবার ফিরে দেখতে চায়। নিজেদের অজান্তেই দু'জনার অতীত স্মৃতির বাঁধনে বাঁধতে চায়। তখন তাদের দেখে মনে হয়—

> "ওরা এই সংসারের দুটি সহজীবন যাত্রী; আর সে জীবনযাত্রায় কোনো খুঁত আছে বলে মনে হয় না।"[৩]

একে অপরের প্রতি মমতা অনুভব করে। 'হৃদয় খুঁড়ে বেদনা'[৪] হয়তো জাগিয়ে তোলে না তারা; তবু হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার রেশটুকু এখনো যেন বিলীন হয়ে যায়নি জেনে আনন্দ-বেদনা-মিলেমিশে এক হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত "তুমি ভুলতে পেরেছ আমাকে?"[৫] — শতদলের এই প্রশ্নের উত্তর মাধুরী দেখি গল্পে দেয় না। বরং শতদলের মন নিয়ে কিছুটা মজাই সে করেছে। তারপর অনাদির সঙ্গে সে চলে গেছে। অধিকার, দাবি, অভিমান শব্দগুলি তাদের পারস্পরিক জীবনে ক্ষণিকের জন্যও আর সত্য হয়ে উঠল না। গল্পে এক জতুগৃহ ছেড়ে এসেও আবার আরেক জতুগৃহ হয়ে উঠেছে রাজপুরের ওয়েটিং রুম। তবে এই জতুগৃহের ব্যঞ্জনা অন্যমাত্রা নিয়েছে, যেখানে তীব্রভাবে অন্তর্দগ্ধ হয়েছে শতদল। এখানেই মাধুরীর পাশে অনাদিকে দেখে তার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, যা মাধুরীর কথায় "মিছি মিছি রাগ"[৬] অ্যাখ্যা পায়। শতদলের মুখে তিক্ত কথা শুনে মাধুরীর মনেও কষ্ট হয়। তবু শেষ পর্যন্ত—

> "এই জতুগৃহকে যাবার আগে জ্বালিয়ে দিয়ে নয়, একটু বুঝিয়ে দিয়ে আর হাসিয়ে দিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় মাধুরী।"[৭]

সেই হাস্যে বুঝি বা কিছু কৌতুক ও ব্যঙ্গ মিশে ছিল। তাঁর ফলে—

> "জতুগৃহে আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ লাগলো না, লাগলো উচ্চ হাসির প্রতিধ্বনি।"[৮]

অর্থাৎ তাদের পরস্পরের ভালোবাসা মুহূর্তের জন্য দু'জনকে ভালোবাসার আলিঙ্গনে বাঁধতে চাইলেও তা আর হৃদয়কে তপ্ত করতে পারে না। আজ তা সামাজিক দিক থেকে অন্যায়, অনৈতিক বলে গণ্য হয়।

চলচ্চিত্রে ওয়েটিং রুমের ঘটনা এসেছে ছবির একেবারে শেষলগ্নে। সিনেমায় দেখানো হয়েছে তিনটি দাম্পত্যের ত্রিবিধ চিত্র। একটি দাম্পত্যে নিখিলেশ ও তার স্ত্রী, যারা শুধুমাত্র তাদের সন্তানের মুখ চেয়ে এক ছাদের নীচে থাকতে বাধ্য হয়। সন্তান না থাকলে তারা হয়তো কবেই একে অপরের থেকে অনেক দূরে চলে যেত। তারা সুখের জন্য হলেও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে উঠে। একটা সুখী গৃহকোণ থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের মন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। যে পথ আর কোনোদিন মিলবে না। আরেকটি দাম্পত্য সুপ্রিয় ও তার স্ত্রীকে ঘিরে রচিত হয়েছে। তাদের দুটি সন্তান। নিত্য অন্নাভাব হলেও একটু ভালো জীবনযাপনের জন্য প্রতিক্ষণ প্রয়াসরত। এই দারিদ্র্যকে সঙ্গে নিয়েও তারা সুখী। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আনন্দে ও সুখের দাম্পত্য।

শতদল ও মাধুরীকে নিয়ে তৃতীয় দাম্পত্যের চিত্রটি গড়ে উঠেছে। এটিই চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রের মূল কাহিনি। তারা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। তারা দু'জনেই মার্জিত, বিনীত ও সংযত স্বভাবের। তবু সন্তান না হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব ক্রমশই বাড়তে থাকে। এদিকে শতদল শিশু খুব ভালোবাসে কিন্তু মাধুরীর শারীরিক সমস্যার জন্য তারা সন্তানসুখ পায়নি। অবশ্য শতদল আর মাধুরীর সম্পর্কের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য বা ভুল বোঝাবুঝির বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। মাধুরীর মানসিক গ্লানি, অপরাধবোধ শতদলের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। শতদলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উত্তেজিত মাধুরীর হাত থেকে কাঁচের গ্লাস পড়ে ভেঙে যায়। মাধুরী কাঁচের টুকরোগুলো ফেলে দেবে বলে কুড়িয়ে নেয়। কেননা, কোনো জিনিস ভেঙে গেলে তা তুলে ফেলে দিতে হয় নইলে কোথাও কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়। এই ভাঙা টুকরোগুলোকে পুনরায় জোড়া লাগানো যায় না। সম্পর্কও তেমনই। এই ইঙ্গিতপূর্ণ, অর্থবহ, ব্যঞ্জনাধর্মী দৃশ্যটি চলচ্চিত্রে যেন একথাটাই বোঝাতে চায়।

চিত্রনাট্যে দেখি, বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও শতদল-মাধুরী কেউই আর নতুন করে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তারা কেউ কাউকে ভুলতে পারেনি। দাম্পত্যের প্রথমদিকে শতদল-মাধুরী কলকাতা শহরে জমি কিনে সুন্দরভাবে প্ল্যান করে বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছিল। বাড়ি তৈরির মাঝপথেই জানা যায়, মাধুরী কোনোদিন আর মা হতে পারবে না। সেই মুহূর্তেই মাধুরী সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার জন্য শতদলও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। নষ্টনীড়ের তাৎপর্যের দিক থেকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 377 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এটিও জতুগৃহে পরিণত হয়। এই দৃশ্যটা চলচ্চিত্রকার তপন সিংহ খুবই সুন্দর সুনিপুণ শিল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। বাড়িটি তৈরি শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা আর একসঙ্গে থাকতে পারল না। তারা বিবাহের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। মাধুরীর মনের মধ্যে সন্তানহীনতার জন্য যে কষ্টের আগুন অহর্নিশ প্রজ্জ্বলিত ছিল, সেই আগুনই তাদের গৃহকে জতুগৃহে পরিণত করল। তারপর চলচ্চিত্রে দেখা যায় দীর্ঘ সাত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের পরে হঠাৎই তাদের একদিন দেখা হয়ে যায় একটি জংশন স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে। দু'জনে বসে আছে দুটি কেদারায়। মাঝখানে একটা বড় টেবিলের ব্যবধান। এই ওয়েটিং রুমেই দীর্ঘ সাত বছর পরে আবার তারা মানসিক দূরত্ব মিটিয়ে মনের কাছাকাছি আসে। কোনো রাগ নয়, অভিমান নয় বরং তারা অনুভব করে সবটা এখনো শেষ যায়নি। এই না-জানা টুকু জানতে পেরে তাদের ভালো লাগে। গল্পের প্রতীক্ষালয়ের মতো সিনেমার প্রতীক্ষালয় জতুগৃহ হয়ে ওঠেনি। বরঞ্চ, এই আকস্মিক সাক্ষাতে মাধুরী-শতদলের হৃদয় সজল এক অনুভূতিতে ভরে গেছে। তারা আবার দু'জন দু'জনাকে ছেড়ে গেল ঠিকই, তবে কোনো ক্ষোভ মনের মধ্যে নিয়ে নয়, নস্টালজিক এক অনুভূতিতে হৃদয়কে সমৃদ্ধ করে নিয়ে যায় তারা। এখানেই সাহিত্যের থেকে চিত্রনাট্যে তপন সিংহের নিজস্ব শিল্পভাবনা ও দর্শনের উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাগিনা মাহাতো (১৯৭০) : গৌরকিশোর ঘোষের ছোটগল্প 'সাগিনা মাহাতো'-র ঘটনা অবলম্বনে তপন সিংহ 'সাগিনা মাহাতো' চিত্রনাট্য নির্মাণ করেন। গল্পের ঘটনাকাল তিন বছর পূর্বের। 'সাগিনা মাহাতো' বাংলা চলচ্চিত্রেও কাহিনি এগিয়েছে খুব সুন্দর সিনেমাটিক ভঙ্গিতে— একবার বর্তমান, একবার ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে। গল্পে আছে, পাহাড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন। কোম্পানির মালিকপক্ষের অকথ্য শোষণ। সাগিনা শ্রমিকদের তথাকথিত নেতা না হলেও তার কথা সবাই শুনে চলে। শ্রমিক শ্রেণি থেকে কলকাতার নেতারা সাগিনাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে, তাকে ওয়েলফেয়ার অফিসার বানালে সাগিনার মজদুর সত্তার বিনষ্টি ঘটে। সকল শ্রমিক তাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে তাদের মনের আক্রোশে প্রচণ্ড মার খেয়ে সাগিনা অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফেরার পর সাগিনার শেষকথা—

> "খালি বান্দর নাচ নেচেছি। কি আফসোস!"[৯]

তারপর তার রেলে কাটা দেহটি পাওয়া যায় রেললাইনের পাশে। হতে পারে তা খুন। হতে পারে তা আত্মহত্যা। যাই হোক না কেন, শহরের কিছু মানুষের স্বার্থান্বেষী চিন্তাধারায় শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করতে গিয়ে একজন সম্ভাবনাময় শ্রমিকের ভবিষ্যতের অপমৃত্যু ঘটলো। এটাই হল গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়।

চিত্রনাট্যেও তপন সিংহ একই ঘটনা দেখিয়েছেন ঘটনা পরম্পরার ভিত্তিতে। তবে চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রের শেষে তিনি সাগিনার মৃত্যু দেখাননি। কলকাতার শ্রমিক সংঘের নেতা অনুপম দত্তের সত্যিই ভালো উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু স্বার্থান্বেষী হিংসাপরায়ণ অনিরুদ্ধবাবু প্রথম থেকেই সাগিনাকে শেষ করে দেওয়ার সংকল্প করেছিলেন। তার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি সাগিনাকে ওয়েলফেয়ার অফিসার তৈরি করেন। অন্যদিকে সেই সময় কিছু বিশ্বাসঘাতক শ্রমিককেও তিনি দলে টানেন। তাদের কথাতেই সকল শ্রমিক প্রথমে ভুল বোঝে সাগিনাকে। তার প্রাণের বন্ধু বিমল, গুরুং মুখ ফিরিয়ে নেয়। অনিরুদ্ধবাবু সাগিনাকে শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলকাতায় নিয়ে যান। সাগিনা ফিরে আসার পরেও বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। ক্যামেরায় খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়ে বিষয়টি। সাগিনা পাহাড়ের ওপর থেকে কথা বলে। আর অন্য সমস্ত শ্রমিক নীচে। চলচ্চিত্রেও সাগিনা শ্রমিকদের হাতে মার খায়। কিন্তু সে আত্মহত্যা করে না। অনিরুদ্ধবাবুর বন্দুকে গুলিতে নিহত হন। শ্রমিকেরা শেষপর্যন্ত বুঝতে পারে যে অনিরুদ্ধবাবুই দোষী, তিনিই প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক। ফলে তাঁকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। শ্রমিকদের মাঝখানে তাদের সঙ্গে আবার একজোট হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য সাগিনা বেঁচে থাকে। চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্রের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকদের অপমৃত্যুকে দেখানো হয়নি। এক নতুন আশার সঞ্চারকে আবাসিক করে চলচ্চিত্র শেষ হয়। চলচ্চিত্রকার তপন সিংহ বাংলাতে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন ১৯৭০ সালে। ওই বছরেই 'সাগিনা মাহাতো' ছবিটি হিন্দি ভাষাতেও নির্মিত হয়। হিন্দি চলচ্চিত্রটির নাম দেন— 'সাগিনা'। বাংলা চলচ্চিত্রটির থেকে হিন্দি ছবিটি বোধহয় অনেকাংশেই সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জনের কথা ভেবেই তৈরি হয়েছিল। হিন্দি 'সাগিনা'-র মধ্যে নাটকীয়তার পরিমাণ অনেকটাই বেশি। বাংলা চিত্রনাট্যের দর্শনের শিল্পগত উৎকর্ষতার দিক থেকে অনেকটাই তারতম্য লক্ষ করা যায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 377 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখনই (১৯৭১) : রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই' উপন্যাস অবলম্বনে তপন সিংহ 'এখনই' চিত্রনাট্য নির্মাণ করেন। এই চলচ্চিত্র নির্মাণে তপন সিংহ তাঁর মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আগেকার মানুষের মানসিকতার সঙ্গে বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের মানসিকতার কত ফারাক সেটা ধরা হয়েছে 'এখনই' উপন্যাসে। চলচ্চিত্রে ভবিষ্যতের আশায় নয়, তারা বর্তমানে বাঁচতে চায়— এই অংশটি উঠে এলেও উপন্যাসের মতো ততটা উজ্জ্বলতা পায়নি।

মুখ্য চরিত্র অরুণের প্রেমিকা রুণু। অরুণের বন্ধুত্ব ঊর্মির সঙ্গে। সে যখন ঊর্মির সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে তখন তার রুণুর জন্য মন কেমন করেছে। রুণু আর ঊর্মি দুজনকেই সে ভালোবাসে। কিন্তু দুইজনের ভালোবাসার ধরন দু'রকম। তৎকালীন কালোবাজারির সময়ে দাঁড়িয়ে একজন ছেলে ও একজন মেয়ের নির্মল বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন লেখক। অয়নের সঙ্গে নিজের ক্ষণিকের ভুলে ঊর্মি যখন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে তখনও তার অরুণের কথা মনে হয়েছে। অরুণই একমাত্র বন্ধু যে ঊর্মিকে এই লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারে। অরুণ ঊর্মিকে নিয়ে যায় ডাঃ রুদ্রের কাছে। ফর্মে ঊর্মির স্বামীর স্বাক্ষর করে দেয় অরুণ। শঙ্কামুক্ত হয়ে ফিরে আসার পর ঊর্মি কত নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় অরুণকে বলে— তার কাছে আবার ঊর্মির কৃতজ্ঞতা কী! বন্ধুত্ব তাদের কতখানি কাছে আনলে বা অন্তরঙ্গ হলে তবে একথা বলা যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রে ঊর্মির সঙ্কটের মুহূর্তে অরুণের কাছে এলে অরুণ ঊর্মিকে রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। বন্ধুত্বের মৃত্যু হয় এখানে। তবে উপন্যাসে ঊর্মির এই ধরনের সঙ্কটমোচনের একটি নেতিবাচক দিক আছে। ভুলপথে পা বাড়ালেও তরুণীরা হয়তো ভাবতে পারে, এত সহজ উপায়ে মুক্তি পাওয়া যায়! কিন্তু চলচ্চিত্রে অরুণের মতো বন্ধু সবার থাকে না, যে এতখানি উদার হতে পারে, অন্যের সন্তানের দায়িত্ব চিরতরে গ্রহণ করতে পারে। উপন্যাসে রুণু চরিত্রের যে বিস্তার, চলচ্চিত্রে সেখানে প্রস্ফুটিত হয়নি। ছবিতে সে খুবই সীমিত পরিসরে ধরা পড়েছে। কিন্তু তপন সিংহ তাঁর এই চিত্রনাট্যে ঊর্মির সঙ্কটের মুহূর্তকেই বেশি ফোকাস করেছেন। উপন্যাসের পার্শ্বচরিত্র সুজিত চলচ্চিত্রে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু সুজিতের প্রেয়সী হিসেবে রুণু অনেকটাই সরে গেছে। চলচ্চিত্রে সম্পর্কের অনুভূতি, মাত্রা, বন্ধু ও প্রেয়সীর পৃথক সত্তা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে।

রাজা (১৯৭৫) : প্রফুল্ল রায়ের 'আলোয় ফেরা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজাকে কেন্দ্র করে তপন সিংহ চিত্রনাট্যের কাহিনিকে বিন্যস্ত করেন। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজার নামেই চিত্রনাট্য তথা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। জীবনের আবর্তে সে ডুবতে ডুবতে হারিয়ে গেছে, তার জীবনের আলোও নিভে গেছে। রমলাদির হাত ধরে সে কখন পাপের জগতে প্রবেশ করতে পারে না। আর্থিক সমস্যার সমাধান করে দেয় ঠিকই কিন্তু জীবনে তার দেখানো আলোয় জীবন কখনো আলোকিত হয় না, পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। জয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাকে রমলাদির পাতা ফাঁদ থেকে বাঁচাতে গিয়ে জয়ার হাত ধরেই কদর্য অন্ধকূপতুল্য জীবন থেকে রাজার আলোয় ফেরা। উপন্যাসে রাজার জীবন একসময় সত্যিই সুস্থ ও সুন্দর ছিল। সে তখন কলেজে পড়ত। বৌদির সঙ্গেও ছিল তার মধুর সম্পর্ক, যার কথা মনে পড়লে তার এখন প্রথমেই একটি অশ্লীল শব্দ 'শালি' মনে আসে। জয়ার জাদুহস্ত যেন দেওর-বৌদির সম্পর্ককে আগের মতো মধুর করে তোলে। রাজার কোনো পূর্বকথা তপন সিংহ চিত্রনাট্যে দেখাননি। তাই কোনো নস্টালজিয়া তার মনকে মেদুরতা এনে দেয় না, তার কোথাও ফিরতে চাওয়াও নেই।

উপন্যাসে দেখা যায় প্রতিটি চরিত্রই অনেক বিস্তারিত আকারে বর্ণিত আছে। যেখান থেকে উপন্যাস শুরু হয়েছে, সেই রাজারও একটা অতীত আছে। রমলাদির বাড়িতে বসেই রাজা রমলাদির সঙ্গে তার পরিচয়ের কথাগুলি স্মরণ করে। উপন্যাস ফ্ল্যাশব্যাকে ঢোকে। এখানে উপন্যাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই।

তপন সিংহ 'আলোয় ফেরা' উপন্যাসকে যখন চলচ্চিত্রায়িত করলেন তখন তার নাম দিলেন 'রাজা'। চিত্রনাট্যে তপন সিংহ বর্তমান ঘটনার মধ্য দিয়েই সূচনা করেছেন, উপন্যাসের মতো অতীত অন্বেষণের ফ্ল্যাশব্যাকের যাননি। উপন্যাসের তুলনায় তপন সিংহের চিত্রনাট্যের আখ্যান ও চরিত্রের সিনেমাটিক বুনন অনেক বেশি দৃঢ় ও মজবুত।

উপন্যাস ও চলচ্চিত্র-দুটি সংরূপেই রমলাদি নিষ্কলুষ ফুলের মতো জয়াকে তুলে দেয় রাজার হাতে (চলচ্চিত্রে মিস্টার ঠাকুর) আগরওয়ালার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। জয়ার অজান্তেই বেশ্যাবৃত্তির ফাঁদ পাতা হয় সেখানে। ছিনতাই ও রেল ইয়ার্ডের মাল পাচারকারী রাজাকে এ হেন কাজেও অঙ্গীভূত করে নিতে চায় রমলাদি। দুই ক্ষেত্রেই আমরা দেখি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 377 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজা জয়াকে নানা ছল করে কিছুতেই আগরওয়ালার কাছে সমর্পণ করে না। উপন্যাসে রাজা অনেক বেশি প্রতিবাদী হলে স্পষ্ট ভাষায় সে রমলাদিকে বলে—

> "জয়াকে আগরওয়ালার হাতে তুলে দিতে পারবে না।"[১০]

এই প্রতিবাদটা আছে বলেই হয়তো উপন্যাসের রাজা অন্ধকারে থাকা গাছের মতো ঠিক আলো খুঁজে নেয়। জয়াকে পাশে পেয়ে, তার অনুপ্রেরণায় আলোকিত জীবনে পা রাখতে চায়। তার এই চাওয়াতেই উপন্যাস শেষ হয় আলোর ফেরার ইঙ্গিতে। কিন্তু চলচ্চিত্রের রাজা রমলাদির ভয়ে অনেক বেশি ভীরু। স্পষ্ট ভাষায় 'না' বলতে পারে না সে। তাই হয়তো তার আর আলোয় ফেরা হয় না। তবু জয়াকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা সে করে। রমলাদি জয়াকে মিস্টার ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেছে শুনে উন্মাদের মতো ছুটে যায়। কিন্তু পুলিশের ভ্রমপূর্ণ গুলিতে বিদ্ধ হয়ে সবুজ প্রান্তরে রাজা লুটিয়ে পড়ে। মৃত্যুর চির অন্ধকারে ডুবে যায় সে। যে রাজা নিজেকে তুচ্ছ ভাবত, অযোগ্য ভাবত, সেই রাজার জন্যই বেদনায় আর্দ্র হয়ে যায় দর্শকের মন। এখানেই চিত্রনাট্যকার তপন সিংহের নিজস্ব দর্শনের স্বকীয়তার পরিচয় তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। এভাবেই এক যুবক শেষ হয়ে গিয়েও কোথাও যেন থেকে যায় সকলের ভালোবাসায়।

আদমি অউর অওরত (১৯৮২) : প্রফুল্ল রায়ের 'মানুষ' গল্প অবলম্বনে তপন সিংহ 'আদমি অউর অওরত' শিরোনামের স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রনাট্যটি নির্মাণ করেন। স্বল্প সময়ের এই চিত্রনাট্যটিকে টেলিফিল্মের জগতে এক মাইলস্টোন বলা যায়। এখানে দেখি, এক দেহাতি গর্ভবতী মেয়ে পায়ে হেঁটে চলেছে অনেক দূরের হাসপাতালে। এই কষ্টকর পথ চলার ও শারীরিক অবস্থার জন্য তার সাথী হয় একজন অচেনা মানুষ। যার নাম ভরোসালাল (চলচ্চিত্রে যার নাম বংশীলাল)। নিজের রুজি রোজগারের কথা না ভেবে সে এক সহানুভূতিশীল, দরদি মানুষের মতো কাজ করে। গর্ভবতী যার প্রসবকাল আসন্ন সেই মেয়েটিকে সে ফেলে যায়নি। সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা, যার সঙ্গে পূর্বে কোনো সম্পর্ক নেই, দায়বদ্ধতা নেই, তবু সে মানুষ হিসেবে মেয়েটির পাশে থাকে। এই ঘটনা ছোটগল্প ও চলচ্চিত্রে মুখ্য। প্রফুল্ল রায়ের 'মানুষ' গল্পটি তপন সিংহ যেন বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনেছেন। চলচ্চিত্র হিসেবেও তা খুবই উচ্চমানের ও বাস্তবোচিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের শেষে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির ছোঁয়া আনা হয়েছে, যা ছোটগল্পে নেই। হিন্দু বংশীলাল একেবারে শেষে জানতে পারে মেয়েটি জাতিতে মুসলিম, ঝিমরীগাঁওয়ের আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী জুবেদা। জাতিভেদ ভুলে একজন মানুষের পাশে আরেকজন মানুষের থাকা — যে পরিস্থিতিতেই হোক না কেন, এটাই সহৃদয় মানুষের প্রকৃত ধর্ম। এই জায়গাটা চিত্রনাট্যকার তপন সিংহ খুব সুন্দরভাবে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

দিদি (১৯৮৪) : প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পের কাহিনিকে কেন্দ্র করে তপন সিংহ দূরদর্শনের জন্য 'দিদি' নামে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রনাট্য নির্মাণ করেন। গ্রাম্যজীবন থেকে কলকাতা শহরে হারিয়ে যাওয়া রতনের দিদির কাহিনি হল 'মহানগর' গল্পের ও 'দিদি' চিত্রনাট্যের। কলকাতা শহর তাকে দিয়েছে পতিতার জীবন। মহানগরে ধর্ষিতা এক নারীর পতিতালয়ের জীবনে হারিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া— তবু দিদি চপলাকে ভাই রতন খুঁজে পায়। দিদির সন্ধান এবং অতীতে দিদি ও ভাইয়ের খুনসুটিময় মধুর দিনযাপনের কথা বর্তমান ও ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে বিশেষ শিল্পসম্মত রূপ পায়। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পে কলকাতাই হল প্রধান চরিত্র। সেখানেই কোথাও আছে দিদি ও আর সেখানেই দিদির সন্ধান করতে এসেছে তার ভাই। চিত্রনাট্যের মতো নিটোল কাহিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে নেই, গল্পে আভাস মাত্র রয়েছে। মহানগরের ব্যস্ততা এবং গতির সঙ্গে তাল রেখে উল্লম্ফন গতিতে গল্প এগিয়ে গেছে। কিন্তু 'দিদি' - স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই চিত্রনাট্যটি তপন সিংহের সিনেমা জগতের দর্শনের হাত ধরে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

পরিশেষে বলা যায়,তপন সিংহের সাহিত্যকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রগুলি মোটের ওপর সাধারণ দর্শক, চলচ্চিত্র বোদ্ধা সকলেরই উপভোগ্য। সাধারণ জীবনের মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রগুলিতে তিনি ব্যঞ্জনার ও দর্শনের বিভিন্ন স্তরকে তুলে ধরেছেন। এভাবেই তপন সিংহ তাঁর স্বকীয় ভাবনা ও দর্শনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বাংলা ছোটগল্প, উপন্যাসের কাহিনিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র জগতকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 377 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. ঘোষ, সুবোধ, জতুগৃহ, অষ্টম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১১৪-১১৫
২. তদেব, পৃ. ১৫৫
৩. তদেব, পৃ. ১৫৬
৪. তদেব, পৃ. ১৬০
৫. তদেব, পৃ. ১৬২
৬. তদেব, পৃ. ১৬২
৭. তদেব, পৃ. ১৬২
৮. বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৬৫
৯. রায়, প্রফুল্ল, আলোয় ফেরা, পঞ্চম মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৬৯
১০. তদেব, পৃ. ১৮২

Bibliography:

'চলচ্চিত্র আজীবন' – তপন সিংহ (শমীক বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত)
'তপন সিংহ চলচ্চিত্রে আখ্যানের ঐশ্বর্য' – মানবেন্দ্রনাথ সাহা (সম্পাদনা)
'বাঙালির আপনজন তপন সিংহ' – অপূর্ব বিশ্বাস
'তপন সিংহের সার্বিক চলচ্চিত্র বীক্ষা' – আবেশ কুমার দাস